সচিত্র কিশোর ক্লাসিক সিরিজ ০৫

দি অরিগন ট্রেইল

ফ্রান্সিস পার্কম্যান

অলঙ্করণ : ডেভ সাইমন্‌স

রূপান্তর

ফাহাদ আল আবদুল্লাহ

বেঙ্গলবুকস

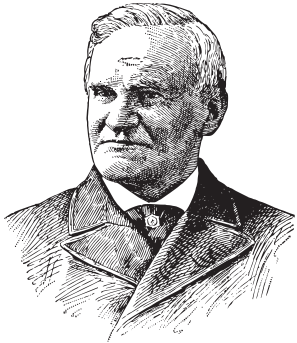

ফ্রান্সিস পার্কম্যান

ফ্রান্সিস পার্কম্যান (১৬ সেপ্টেম্বর ১৮২৩—৮ নভেম্বর ১৮৯৩) একজন আমেরিকান ইতিহাসবিদ ও লেখক। তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বস্টনে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর রচিত বইগুলো ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে যেমন মূল্যবান, তেমনি সাহিত্যিক মানেও সমান গুরুত্বপূর্ণ।

সাদা মানুষদের সংস্পর্শে এসে যেসব ইন্ডিয়ান নিজেদের পরিবর্তন করেনি তাদের প্রতি পার্কম্যানের আগ্রহ এত বেশি ছিল যে, আমেরিকার পশ্চিমের বনে-জঙ্গলে তিনি একবার ছয় মাসব্যাপী ভ্রমণে বের হন। *দি অরিগন ট্রেইল* মূলত এই ভ্রমণেরই ফলাফল। তাঁর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য রচনা হচ্ছে—*দ্য কন্সপিরেসি অব পনটিয়াক অ্যান্ড দ্য ইন্ডিয়ান ওয়ার আফটার দ্য কনকোয়েস্ট অব কানাডা*, *ভ্যাসাল মরট (উপন্যাস)*, *দ্য বুক অব রোজেস* ইত্যাদি।

সূ চি প ত্র

প্র থ ম অ ধ্যা য় । সীমান্তরেখা ০৭

দ্বি তী য় অ ধ্যা য় । যাত্রারম্ভ ২৯

তৃ তী য় অ ধ্যা য় । প্ল্যাট্টে নদীর তীরে ৪৫

চ তু র্থ অ ধ্যা য় । মহিষ ৬৭

প ঞ্চ ম অ ধ্যা য় । পথহারা পথিক! ৮৫

ষ ষ্ঠ অ ধ্যা য় । ল্যারামি দুর্গের পথে ৯৩

স প্ত ম অ ধ্যা য় । স্যু ভোজসভা ১১১

অ ষ্ট ম অ ধ্যা য় । যুদ্ধ! যুদ্ধ? ১২৩

ন ব ম অ ধ্যা য় । ইন্ডিয়ান দিনলিপি ১৪৩

দ শ ম অ ধ্যা য় । ফিরতি পথ ১৬৩

এ কা দ শ অ ধ্যা য় । বুনো মহিষের সন্ধানে ১৭৯

দ্বা দ শ অ ধ্যা য় । আরকানস নদীর বাঁকে ১৯৯

ত্র য়ো দ শ অ ধ্যা য় । প্রত্যাবর্তন এবং বিদায় ২১১

যাত্রার জন্য প্রস্তুত

প্রথম অধ্যায়

সীমান্তরেখা

'ফ্রান্সিস পার্কম্যান!' যে লোকটা হাঁক ছাড়ল, সে আমার বন্ধু ও কাজিন, নাম কুইন্সি অ্যাডামস শ। 'এখন যদি আমাদের হার্ভার্ডের ক্লাসমেট আর বস্টনে বসে আমাদের বাবা-মা আমাদের দেখতেন!'

'তা যা বলেছ কুইন্সি,' আমি বললাম, 'এই বন্য ইন্ডিয়ানদের যদি কাছে থেকে দেখে বুঝতে চাই, তাহলে তাদের জমিতে থেকে একেবারে সামনাসামনি বসে দেখতে হবে। তার জন্য যদি একেবারে রকি পর্বতের চুড়োয় চড়তে হয়, তবে তাই সই। এই যাত্রার জন্য উপযুক্ত পোশাক-আশাক আর যন্ত্রপাতি দরকার।' কুইন্সের পোশাকের দিকে এক নজর তাকালাম, তারপর নিজেকে দেখলাম, বললাম, 'আমরা তৈরি।'

আমাদের পরনে লাল ফ্ল্যানেলের শার্ট, কোমরে বেল্ট,

বাকস্কিনের লেগিংস, পায়ে মোকাসিন। নিরাভরণ স্পেনীয় জিনে রাখা হোলস্টারে ভারী পিস্তল। কুইন্সি সাথে একটি দো'নলা শটগান নিয়ে বেরিয়েছে, আমার সাথে একখানা পনেরো পাউন্ডের রাইফেল। আমাদের সাথের মালবাহী গাড়ির সাদা চাদরের নিচে আছে আমাদের মাল-সামানা—একটি তাঁবু, গোলাবারুদ, কম্বল, খাবার-দাবার আর ইন্ডিয়ানদের জন্য উপহারসামগ্রি।

'আমাদের ধড়াচূড়া,' কুইন্সির পোশাক, ঘোড়া, খচ্চর আর মালবাহী গাড়ির দিকে নজর বুলিয়ে বললাম, 'কঠিন পরিশ্রমের জন্য একেবারে খাপেখাপ, সাজগোজের ব্যাপার নয়।'

১৮৪৬ সালের মে মাস। আমি আর কুইন্সি তখন ওয়েস্টপোর্টে, মিসৌরি নদীর তীরে। ওয়েস্টপোর্ট বন্দরকে আমেরিকা থেকে বুনো পশ্চিমের পানে যাত্রার আরম্ভরেখা বিবেচনা করা হতো। বন্দরের ওপারের যে জঙ্গল, তা পেরিয়ে অরিগন আর ক্যালিফোর্নিয়া, দুই জায়গাতেই আছে প্রায় চার হাজার করে আমেরিকান সেটেলার। কিন্তু ১৮৪৬ সালে, প্রায় তিন হাজার অভিবাসী অরিগন ট্রেইল ধরে পশ্চিমের পানে এক বিপজ্জনক যাত্রায় নেমেছিল।

কেবল এক মাস আগে, এপ্রিল মাসে আমরা সেইন্ট লুইসে এসে পৌঁছেছিলাম। পুরো শহরজুড়ে জীবনের গুঞ্জন।

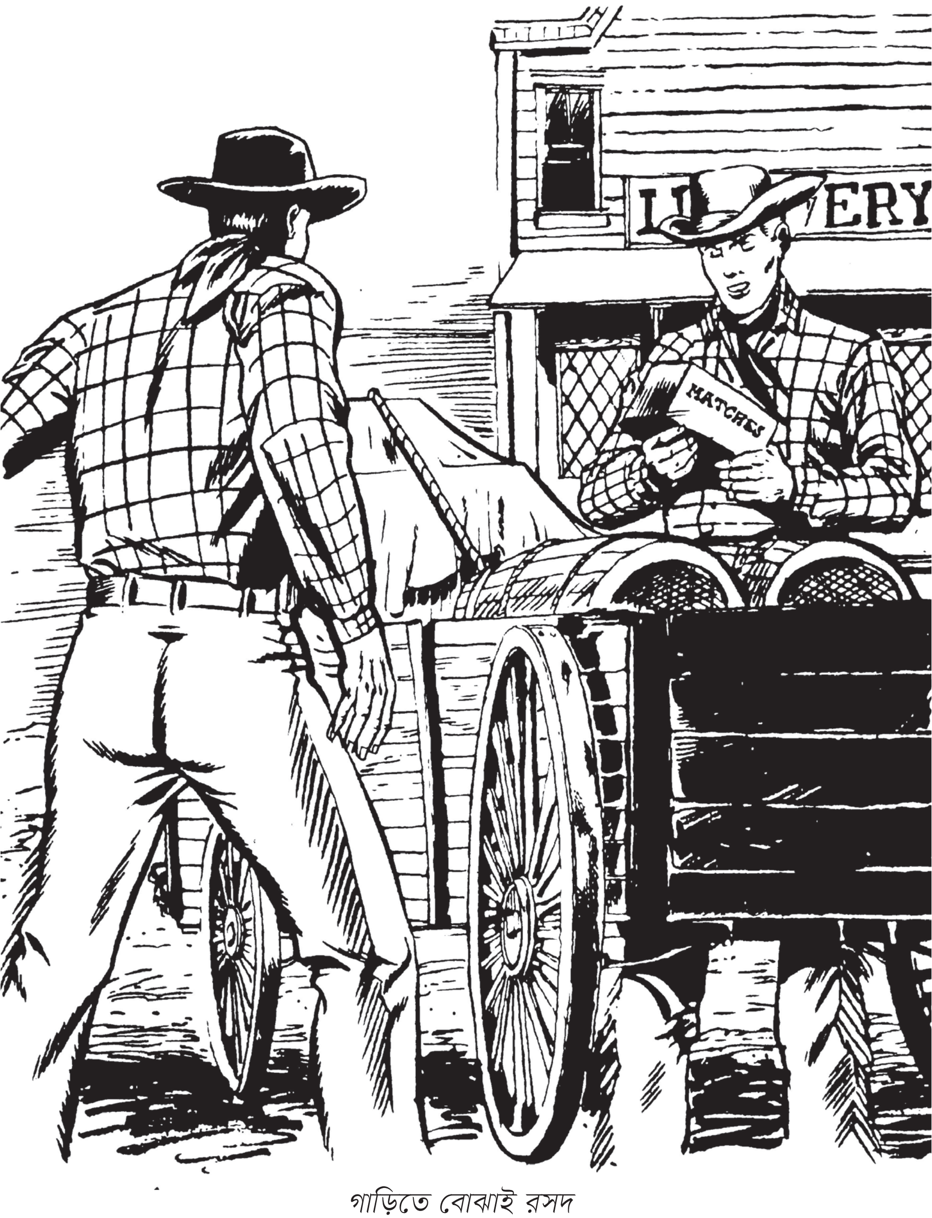

গাড়িতে বোঝাই রসদ

ভাগ্য বদলাতে পশ্চিমের ভূখণ্ডে যাত্রার প্রস্তুতিতে ব্যস্ত বসতি স্থাপনকারীর দল। শহরের প্রতিটি ইঞ্চিতে তাদের আনাগোনা। একদল বণিক সান্তা ফে শহরে যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছে। তাদের গন্তব্য নিউ মেক্সিকো প্রদেশের সান্তা ফে শহর। আমেরিকা পেরিয়ে মেক্সিকো।

সেইন্ট লুইসের হোটেলে জটলা লেগে রয়েছে, আগ্নেয়াস্ত্র প্রস্তুতকারক আর সেটেলাররা সকল অভিযাত্রীদের বন্দুক এবং যাবতীয় মালপত্র সরবরাহ করতে ব্যস্ত। সীমান্তের অভিযাত্রী সকলে ভিড় করেছে স্টিমবোটে। সেগুলো যাত্রা করেছে মিসৌরি অভিমুখে।

সেই অগণিত স্টিমবোটের একটিতে চেপে আমি আর কুইন্সি মিসৌরির দিকে রওনা করি এপ্রিলের ২৮ তারিখে। সান্তা ফে আর অরিগনের যাত্রী, তাদের মণিহারি জিনিসপত্র, ওয়াগন, খচ্চর, ঘোড়া, স্যাডল, হারনেস, ক্যাম্প সাজানোর যন্ত্রপাতি বোঝাই সেই স্টিমবোট পানিতে ডুবে যাবে যেন। নদীর পানি ছলকে স্টিমবোটের ডেকে চলে আসছিল।

এক সপ্তাহ ধরে নদীর দুরন্ত স্রোতের উজানে ভেসে চলল আমাদের স্টিমবোট। কখনো বালিয়াড়িতে আটকা পড়ে রইল ঘণ্টার পর ঘণ্টা, কখনো পানির তলদেশের লুকানো গাছের ডালে ঘষা খেল বোটের খোল। এই ডালগুলো নদীর

মিসৌরি নদীর বুকে ছুটছে স্টিমবোট

ধার ঘেঁষে বেড়ে ওঠা গাছ থেকে এসেছে, নদীর স্রোতে যখন পাড় ভাঙতে শুরু করেছিল, তখন সেই ডালগুলো ভেঙে নদীর কাদাপানির নিচে আশ্রয় নিয়েছে। তারা যেন অপেক্ষায় আছে, যেই না কোনো অভাগা স্টিমবোট তাদের নাগালে আসবে, তার খোলে ফুটো করে দেবে।

নদীর পাড় ঘেঁষে এগোতে এগোতে আমাদের চোখে পড়ল পশ্চিম যাত্রার তোড়জোড়। মিসৌরির ইন্ডিপেন্ডেন্স যাবার পথে সবাই তাঁবু খাটিয়ে রয়েছে।

যখন আমরা ইন্ডিপেন্ডেন্স বন্দরে পৌঁছালাম, আমার চোখে পড়ল চওড়া টুপি মাথায় মেক্সিকানরা। তারা সবাই সান্তা ফে বণিকদের অধীনে কাজ করত, বাকস্কিনের পোশাকে সজ্জিত, লম্বা চুলের ফরাসি শিকারির দল কেবলি পাহাড় অভিযান থেকে ফিরেছে, তাদের সাথে একদল শক্তপোক্ত লম্বা পুরুষ, হাতে রাইফেল—দুঃসাহসী পাইওনিয়ার, তাদের রাইফেল আর কুঠারের বদৌলতেই আলেঘেনি পর্বতের বুক চিরে পশ্চিমের প্রেইরিতে যাবার পথ ধীরে ধীরে সুগম হচ্ছে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে তারাও অরিগনের যাত্রী, অশান্ত চিত্তের এই মানুষদের যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে সুদূরের সেই সমতল।

শহরে লোকে লোকারণ্য। নতুন নতুন সেটেলার আসছে আর যাচ্ছে। আট মাইল দূরের প্রেইরিতে ক্যাম্প পেতে

নদীর গভীরে গেঁথে আছে গাছের ডাল

থাকা হাজার হাজার অভিবাসীদের দঙ্গলে যোগ দিতে যাচ্ছে তারা। সড়কজুড়ে পুরুষ মানুষ, ঘোড়া আর খচ্চরের মেলা। আশেপাশের ডজনখানেক কামারের দোকান থেকে অনবরত হাতুড়ি আর লোহায় ঠোকাঠুকির আওয়াজ, সেখানে ঘোড়া আর ষাঁড়ে টানা ওয়াগন মেরামতের কাজ চলছে, ঘোড়া আর ষাঁড়ের খুরে নতুন নাল পরানো চলছে।

অভিবাসী বোঝাই একটি ট্রেন ইলিনয় থেকে এসেছে। থেমেছে একেবারে মাঝ সড়কে। ওয়াগনের পর্দার আড়াল থেকে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী সব শিশুদের চেহারা উঁকি দিচ্ছে। আশেপাশেই ঘোড়ায় চড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে এক নাদুসনুদুস ভদ্রমহিলা; রোদে পোড়া মুখে মাথার ওপরে ধরে রেখেছেন একটি বিবর্ণ ছাতা। কঠিন চেহারার চাষীরা চাবুক হাতে দাঁড়িয়ে আছে তাদের ষাঁড়ের পালের পাশে। তাদের দেখে আমার একটি কথাই মনে হচ্ছিল, ‘এরা সবাই পশ্চিমে ছুটেছে কেন? নতুন জীবনের আশায়, নাকি সমাজ সভ্যতার দমবন্ধ করা আইন-কানুনের শেকল ঝেড়ে ফেলার ইচ্ছে? নাকি কেবল অস্থিরতা? পশ্চিমের এই যাত্রার শেষে কি তাদের অনুশোচনা হবে?’

মিসৌরি নদীর পাড় থেকে ৫০০ মাইল দূরে ক্যানসাস ল্যান্ডিংয়ে পৌঁছলাম আমরা। জাহাজ থেকে নেমে আমাদের যাবতীয় বাক্স-প্যাটরা একটি পানশালায় রেখে ওয়াগনে

ইন্ডিপেন্ডেন্স বন্দর

চেপে রওনা দিলাম ওয়েস্টপোর্টের দিকে। সেখান থেকেই আমাদের পশ্চিম যাত্রার জন্য ঘোড়া এবং খচ্চর কেনার ইচ্ছে ছিল।

ওয়েস্টপোর্টে প্রচুর ইন্ডিয়ানের দেখা মিলল। পরিষ্কার করে কামানো মাথা, রংমাখা চেহারার স্যাক আর ফক্স গোত্রের ইন্ডিয়ান, লাক-কালো রঙের ফ্রক পরা শনি ও ডেলওয়ার, সাদা মানুষের পোশাকে সজ্জিত ওয়ানডোট আর দারিদ্রের কষাঘাতে জর্জরিত ক'জন ক্যানসাস ইন্ডিয়ান, মোটা চাদড়ে জড়িয়ে রেখেছে নিজেদের। শহরের রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে তারা, তাদের লোমশ ঘোড়াগুলো সার বেঁধে বিভিন্ন বেড়া আর রেইলে বাঁধা।

আমরা যখন পানশালাটির দোরগোড়ায়, তখনি উদয় হলো এক অতিপরিচিত মুখ। সেই লাল মুখ আর রুক্ষ লাল দাড়ি-গোঁফ আমি দুনিয়ার যেকোনো প্রান্তে চিনতে পারব। ইংরেজ সামরিক বাহিনীর ক্যাপ্টেন সি, সাথে তার ভাই জ্যাক ও মিস্টার আর, সবাই মিলে তারা আমেরিকার গহীনে এক মৃগয়ার আয়োজন করছিলেন। কিছু দিন আগেই তাদের সাথে আমাদের দেখা হয়েছিল, সেন্ট লুইসে। আবার দেখা হয়ে গেল এখানে।

কুশল বিনিময় হলো, তারপরে ক্যাপ্টেন সি কাজের কথা পাড়লেন।

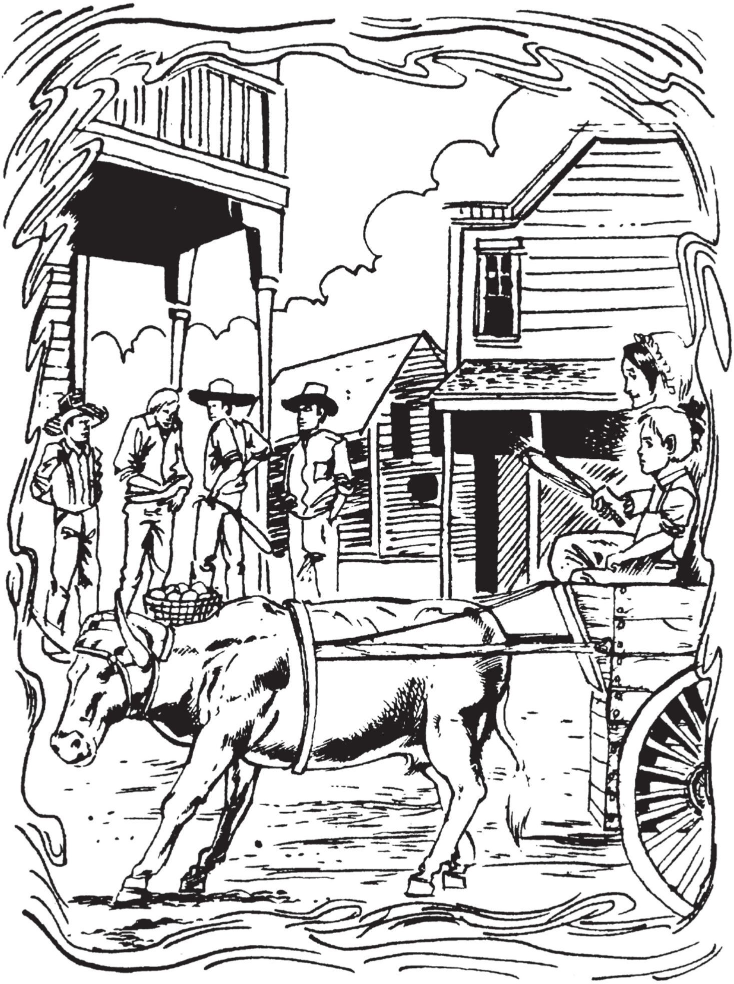

অভিবাসীদের ওয়াগন